পঞ্চম পর্ব

ইসলামের তিন খলিফা ও হযরত আয়েশার (রাঃ) বিরুদ্ধে শিয়াদের অবমাননাকর উক্তি ঃ

১। হযরত আবু বকর (রাঃ)- এর বিরুদ্ধে শিয়াদের অপবাদ ঃ

তোহ্‌ফায়ে ইস্‌না আশারিয়া- কৃত শাহ আবদুল আজিজ দেহলভী (রঃ) নামক গ্রন্থে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)- এর বিরুদ্ধে শিয়াদের কতিপয় অবমাননাকর উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে- যার কিছু নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

(ক) "হযরত আবু বকর (রাঃ) একদিন মসজিদে নববীর মিম্বারে দাড়িয়ে খুত্‌বা দিতে উঠলে হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন (রাঃ) দুই ভাই এসে তাঁকে রাসুলুল্লাহর মিম্বার থেকে নেমে যেতে বলেছিলেন। কাজেই হযরত আবু বকর (রাঃ) খলিফা হওয়ার যোগ্য নন"।

তাদের এই মনগড়া উক্তির জন্য এতটুকু বলাই যথেষ্ঠ যে, সে সময় ইমাম হাসান ও হোসাইন (রাঃ) ৮-৯ বৎসরের বালক ছিলেন। তাদের কথা হাস্যকর।

(খ) "নবী করিম (দঃ) হযরত আবু বকরকে (রাঃ) কোন দ্বীনী গুরুত্বপূর্ণ কাজে নেতৃত্ব প্রদান করেন নি"।

তাদের এই উক্তি মিথ্যা। কারণ, নবী করিম (দঃ) ওহুদ যুদ্ধের পর আবু সুফিয়ানের পশ্চাদধাবন করার জন্য হযরত আবু বকরকে নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন। এছাড়াও ৯ম হিজরীতে মুসলমানদের প্রথম হজ্বে হযরত আবু বকর (রাঃ) কে আমিরুল হজ্ব নিযুক্ত করেছিলেন। হুযুরের ওফাতের ৫ দিন পূর্বে তাঁকে মসজিদে নববীতে হুযুরের স্থলে ইমামতি করার অনুমতি দিয়েছিলেন- যার পিছনে সমস্ত সাহাবা ১৯ ওয়াক্ত নামায আদায় করেছিলেন।

(গ) "হযরত আবু বকর (রাঃ)- হযরত ওমর (রাঃ) কে পরবর্তী খলিফা মনোনীত করে যান- অথচ নবী করিম (দঃ) হযরত ওমরকে একবার যাকাত আদায়ের দায়িত্ব দিয়ে পরে তা প্রত্যাহার করে নেন"।

এর অর্থ কি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা? অন্য কোন যুক্তিসংগত কারণেই হয়তো তিনি তা করেছিলেন।

www.sunnibarta.com

(ঘ) "নবী করিম (দঃ) নিজে কোন 'উত্তরাধিকারী বা খলিফা নিযুক্ত করে যাননি'- অথচ, হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজে ওমর (রাঃ) কে পরবর্তী খলিফা মনোনীত করে যান। এটা সরাসরি নবীজির আদর্শের খেলাফ"।

শিয়াদের এই অভিযোগও মিথ্যা। নবী করিম (দঃ) ইশারা ও ইঙ্গিতের মাধ্যমে হযরত আবু বকর (রাঃ) কে খলিফা নিযুক্ত করেছিলেন। হুযুরের ইশারাই খলিফা নিযুক্তির জন্য স্পষ্ট ঘোষণার সমতুল্য। তদুপরি- মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে যে, ওহীর মাধ্যমে পূর্বেই নবী করিম (দঃ) কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানগণ হযরত আবু বকরকেই খলিফা নিযুক্ত করবে। সুতরাং ঘোষণা দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। তদুপরি- শিয়াদের কথার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, তাদের ইমাম হযরত আলীকেও হুযুর (দঃ) খলিফা নিযুক্ত করে যাননি। 'কোন খলিফা নিযুক্ত করে যাননি'- এই কথাই তার প্রমান।

(ঙ) "হযরত আবু বকর (রাঃ)- বিবি ফাতিমা (রাঃ) কে পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন একমাত্র নিজের বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে। হাদীসটি হলোঃ "আমরা নবী সম্প্রদায় যে সম্পত্তি রেখে যাই- তা সদকা বা জনগণের জন্য দান হিসেবে গন্য হবে। পরিবারের কেউ তা পাবে না"। অথচ কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ "আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তি তোমাদের আওলাদের জন্য নিজে বন্টন করে দিয়েছেন। পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের দ্বিগুণ পাবে।" হযরত আবু বকর কুরআনের উক্ত নির্দেশকে অমান্য করে নিজের শ্রুত হাদীসের দ্বারা বিবি ফাতিমাকে রাসুলুল্লাহ্ (দঃ)- এর সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন।"

শিয়াদের এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেননা, উক্ত হাদীসখানা হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামন, জুবাইর ইবনুল আওয়াম, আবু দারদা, আবু হুরায়রা, আব্বাস, হযরত আলী, হযরত ওসমান, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস- প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম থেকেও বর্ণিত হয়েছে- শুধু একা হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকে নয়। দ্বিতীয়তঃ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) নিজ কন্যা বিবি আয়েশাকেও নবীজীর সম্পত্তি দেননি। হযরত আব্বাসকেও দেননি। ফারায়েয মতে তাঁরাও সম্পত্তির মালিক হতে পারতেন। আল্লাহ্র এই বাণী সাধারণ মুমিনদের বেলায় প্রযোজ্য- নবীজীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এ জন্যই কোরআনে "তোমাদের বহুবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। হযরত ফাতিমা (রাঃ) নবীজীর হাদীস সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। যখন জানতে পারলেন, তখন তিনিও দাবী প্রত্যাহার করে নিলেন। সুতরাং শিয়াদের এই অভিযোগ হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত- সত্যের উপর নয়। তদুপরি হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ফাতিমা (রাঃ)- এর জন্য এর পরিবর্তে বাইতুলমাল থেকে ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

(চ) "নবী করিম (দঃ) ফিদাকের এক খন্ড জমি বিবি ফাতিমা (রাঃ) কে হেবা সূত্রে দান করেছিলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তা থেকেও বিবি ফাতিমাকে বঞ্চিত করেছেন"।

www.sunnibarta.com

শিয়াদের এই অভিযোগ সত্য নয়। কেননা, নবী করিম (দঃ) হেবা করে থাকলে নিশ্চয়ই দখল বুঝিয়ে দিতেন। কিন্তু তিনি দখল বুঝিয়ে দেন নি এবং বিবি ফাতিমাও দখল নেননি। সাময়িকভাবে উৎপন্ন ফসল ভোগ করার জন্য দেয়া হয়েছিল মাত্র। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) যখন বায়তুল মাল থেকে বিবি ফাতিমার পরিবারের জন্য ভাতা নির্ধারিত করলেন, তখনই উক্ত জমি সরকারী কোষাগারে নিয়ে নেয়া হয়। বিকল্প ব্যবস্থা না করে উক্ত জমি ছিনিয়ে নিলে দোষ দেয়া যেতো। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছেঃ বিবি ফাতিমার ঘরে তিনি নিজে গিয়ে ব্যাপারটি বুঝিয়ে বললে বিবি ফাতিমা (রাঃ) তাতে রাজী হয়ে যান। নিষ্পত্তিকৃত বিষয়টি নিয়ে শিয়ারা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা অভিযোগ দাঁড় করেছে।

(ছ) "হযরত আবু বকর (রাঃ) শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। তাই তিনি এক চোরের বাম হাত কেটে দিয়েছিলেন"।

শিয়াদের এই অভিযোগ মিথ্যা। রাসুলুল্লাহ (দঃ)- এর সাহাবীগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সাহচর্য্য পেয়েছিলেন হযরত আবু বকর ও হযরত আলী। পূর্ণ ২৩ বৎসর তাঁরা উভয়েই ছায়ার মত নবী করিম (দঃ)- এর সাথে সাথে থাকতেন। এজন্যই বাতিনী ইলমের ৪টি তরিকার মধ্যে কাদিরিয়া ও চিশ্‌তিয়া দুটি তরিকার উৎসমূল হলেন হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ছিলেন নক্‌শবন্দিয়া ও মুজাদ্দিদীয়া তরিকার উৎসমূল। **হযরত আবু বকর (রাঃ) তৃতীয়বার চুরির অপরাধে বাম হাত কেটে ছিলেন। এটাই শরীয়তের বিধান।** সুতরাং কম ইল্‌মের অপবাদ আদৌ সত্য নয়।

(জ) শিয়াদের মতে- "হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ) তিনজনই ছিলেন মুনাফিক-প্রকৃত মুসলমান নন। (নাউযুবিল্লাহ্)।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত- এর মতে এই জঘন্য অপবাদদাতা শিয়ারা ইসলাম ও নবীর দুশমন। শিয়াদের মতেই- ইমাম হযরত আলী (রাঃ) নিজে তিনজন খলিফার যুগে তাদের উজির সভার সদস্য ছিলেন এবং তাঁদের পিছনে নামাযও পড়েছিলেন। তাছাড়া যদি তাঁরা ঐ রকমই হতেন- তাহলে হযরত আলী (রাঃ) নিশ্চয়ই তাঁদের উযির হতেন না এবং তাঁদের পিছনে নামাযও পড়তেন না। শিয়াদের এই বিশেষ সাহাবী দুশমনি বর্তমানেও কোন কোন মুসলমানের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এটা শিয়া প্রভাবেরই ফল। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) কে মুনাফিক বলা হারাম। (ইরফানে শরিয়ত)।

(ঝ) শিয়াদের মতে ঃ "যেকোন ভাল কাজ করার পূর্বে বিসমিল্লাহ্‌র পরিবর্তে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) কে অভিসম্পাত করা অধিক উত্তম"।

আল্লাহ্ যেসব সাহাবীদের শানে "রাদিয়াল্লাহু আনহু" বলেছেন- সেই সাহাবীগণের শীর্ষস্থানীয় দুজনকে শিয়াদের লানত করা বা অভিসম্পাত করা দ্বীন ও ঈমানের পরিপন্থী কাজ।

একটি কারামতি ঘটনা ঃ

তাফসীরে রুহুল বয়ানে উল্লেখ আছে ঃ ইমাম আবু হানিফা (রাঃ)- এর যুগে তাঁরই প্রতিবেশী জনৈক রাফিজীর (চরমপন্থী শিয়া) দুটি গাধা ছিল। সে একটির নাম রাখে আবু বকর- দ্বিতীয়টির নাম রাখে ওমর। এভাবে সে মনের ঝাল মেটাচ্ছিল। একদিন শুনা গেল- একটি গাধার লাথিতে উক্ত রাফিজী নিহত হয়েছে। একথা শুনে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) জনৈক শাগরিদকে ঘটনার খোঁজ নিতে বললেন এবং মন্তব্য করলেন যে, সম্ভবতঃ ওমর নামীয় গাধাটিই রাফিজীকে খুন করে থাকবে। শাগরিদ ঘটনা যাচাই করে এসে বললেন- হুযুর! আপনার কথাই ঠিক। (সোব্‌হানাল্লাহ)।

শিয়ারা হযরত আলী ও পাক পাঞ্জাতনের পক্ষপাতিত্ব করতে গিয়ে অন্য সাহাবীদেরকে কাফির, মুনাফিক, মুরতাদ- ইত্যাদি অশালীন বাক্যে জর্জরিত করেছে। নবী করিম (দঃ) এর সতর্ক বাণী হচ্ছে "আমার সাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহর গযবের ভয় করো। তাঁদেরকে তোমরা সমালোচনার শিকারে পরিণত করো না। তাঁদের প্রতি ভালবাসা আমার প্রতি ভালবাসারই প্রতীক এবং তাঁদের প্রতি দুশমনি আমার প্রতি দুশমনিরই প্রতীক।" (বুখারী)।

২। হযরত ওমর (রাঃ)- এর বিরুদ্ধে অপবাদ ঃ

(ক) শিয়ারা হযরত ওমর (রাঃ) এর বিরুদ্ধে একটি জঘন্য অপবাদ আরোপ করে বলেছে যে, বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, নবী করিম (দঃ) অসুস্থ অবস্থায় ইনতিকালের ৫ দিন পূর্বে বৃহস্পতিবার দিন যোহর নামাযের পর হতে আর মসজিদে যেতে পারেননি। অসুখে তিনি ক্ষনে ক্ষনে অস্থির হয়ে উঠতেন। এমন অবস্থায় হুজরা মুবারকে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে তিনি এরশাদ করলেন- "তোমরা কাগজ নিয়ে এসো- আমি এমন কিছু লিখে দিয়ে যাবো- যাতে তোমরা আর কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।"

সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়ে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। কেহ বললেন- কাগজ কলম নিয়ে আসুন। আবার কেহ বললেন- এমতাবস্থায় হুযুর (দঃ) কে কাগজ কলম দেয়া ঠিক হবে না। কুরআন মজিদ তো পূর্ণ নাযেল হয়ে গেছে এবং দ্বীন পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেছে বলে কুরআনেই ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং হুযুর (দঃ) কে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? তিনি অসুখের তাড়নায় এমনিতেই অস্থির। হযরত ওমর (রাঃ) ছিলেন এই মতের মধ্যমণি। আল্লাহর নবীর সামনে এভাবে বিতর্ক করা অশোভনীয় ছিল। সাহাবায়ে কেরামের বিতর্ক দেখে নবী করিম (দঃ) বলে উঠলেন- "আমাকে একা থাকতে দাও, আমি এখন যে অবস্থায় আছি, তোমদের বিতর্কের চাইতে এটা অনেক উত্তম।"

একথা বলেই তিনি তিনটি বিষয় উল্লেখ করলেন। যথা ঃ (১) আরব উপদ্বীপ থেকে তোমরা মুশরিকদেরকে বহিস্কার করে দেবে (২) আমি যেভাবে কোন প্রতিনিধি

www.sunnibarta.com

দলকে খাতির সম্মান করেছি, তোমরাও অনুরূপ করবে (৩) ইবনে আব্বাস বলেনঃ তৃতীয়বারে হয় তিনি চুপ ছিলেন অথবা কিছু বলেছিলেন- কিন্তু আমি তা ভুলে গেছি"। (বুখারীঃ কিতাবুল ইলম অধ্যায়, কিতাবুল মুয়াদায়াহ, কিতাবুল মাগাজী, কিতাবুল মারাদ ওয়াত তিব্ব, কিতাবুল ইতিছাম)।

শিয়াগণ এই সূত্র ধরে হযরত ওমর (রাঃ)- এর উপর আক্রমন পরিচালনা করে বলেছে- নবী করিম (দঃ)- এর প্রতিটি বাণীই ছিল ওহী দ্বারা পরিচালিত। হযরত ওমর (রাঃ) নবী করিম (দঃ) এর নির্দেশ অমান্য করে প্রকারান্তরে ওহীতে বাধা সৃষ্টি করেছেন। ওহীতে বাধা সৃষ্টি করা কুফরী"।

শিয়াদের এই আক্রমনের জবাব দিতে গিয়ে মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেছেন (১) হযরত ওমর (রাঃ) যদি হুযুর (দঃ)- এর নির্দেশ অমান্য করে দোষী সাব্যস্থ হন, তাহলে হযরত আলীও (রাঃ) তো হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্র লিখতে গিয়ে নবী করিম (দঃ) -এর একটি নির্দেশ অমান্য করেছিলেন। সেটি হলো 'রাসুলুল্লাহ' শব্দটি বাদ দেয়ার জন্য হুযুর (দঃ) হযরত আলীকে নির্দেশ করলে আলী (রাঃ) তা করতে অস্বীকার করেন। কিন্তু কেউ তো- এমনকি শিয়ারাও ঐ কাজকে দোষনীয় বা 'ওহীতে বাধা দান' বলে মন্তব্য করেনি! হযরত ওমরের বেলায় শিয়ারা দোষারোপ করছে কেন?

আসলে ব্যাপারটি ছিল নবীর প্রেম ও ভালবাসা। হযরত আলী যেমন নবীজীর মহব্বতে 'রাসুলুল্লাহ' শব্দটি বাদ দিতে ইতস্ততঃ করছিলেন- হযরত ওমরও (রাঃ) তদ্রূপ হুযুরের কষ্ট হবে বলে কলম আনতে ইতস্ততঃ করেছিলেন। যদি তা খোদার অলংঘনীয় ওহী-ই হতো এবং লিখা বাধ্যতামূলক হতো- তাহলে নবী করিম (দঃ) পরবর্তী সময়ে অবশ্যই তা লিখে দিতেন- নতুবা রিসালাতের দায়িত্ব পালনে অবহেলা বলে তা সাব্যস্ত হতো। মোট কথা- হযরত আলীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি যেমন পরামর্শমূলক ছিল এবং বাধ্যতামূলক ছিলনা- তদ্রূপ হযরত ওমরের (রাঃ) বেলায়ও পরামর্শমূলক ছিল। শিয়াগণ হযরত ওমরের বেলায় আক্রমনমূলক কথা বললেও হযরত আলীর বেলায় একেবারেই চুপ। এটা ইনসাফের খেলাপ।

(খ) শিয়াগণ দ্বিতীয় অভিযোগে বলে ঃ "হযরত ওমর (রাঃ) শরীয়তের কোন কোন বিধি বিধান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন না। খিলাফতের জন্য শরীয়তের পূর্ণ জ্ঞান থাকা জরুরী। হযরত ওমরের তা ছিল না। সুতরাং তিনি খিলাফতের যোগ্য ছিলেন না"। উদাহরণ স্বরূপ শিয়াগণ বলে- হযরত ওমর (রাঃ) জ্বেনার দ্বারা গর্ভবতী এক মহিলাকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দিয়েছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) এই রায় সংশোধন করে বলেছিলেন- অপরাধ হলো মহিলার। তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হলে তার পেটের সন্তানকেও হত্যা করা হবে। এটাতো শরীয়তে বৈধ নয়। তখন হযরত ওমর (রাঃ) আনন্দে বলে উঠলেন "আলী না থাকলে ওমর আজ ধ্বংস হয়ে যেতো"।

www.sunnibarta.com

শিয়াদের এই অপবাদের জবাব আহ্‌লে সুন্নাতের মুহাদ্দিসীনগণ এভাবে দিয়েছেন- হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট শুধু জ্বিনার প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয়েছিল- গর্ভধারনের বা পেটের সন্তানের কোন প্রমাণ তাঁর কাছে ছিল না। যখন হযরত আলী (রাঃ) গর্ভের সন্তানের সংবাদ দিলেন- তখন হযরত ওমর (রাঃ) গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুদন্ড স্থগিত রাখেন। কারও কাছে কোন বিষয়ের প্রমাণ না থাকার অর্থ শরীয়তের জ্ঞানের অভাব নয়। এটা হয়েছিল সাক্ষীর অভাবে। এটা হলো শিয়াদের অপকৌশল মাত্র।

(গ) শিয়াগণ বলে ঃ হযরত ওমর (রাঃ) দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু বিদআত চালু করেছেন- যা দ্বীনের অংশ নয়। যেমন- তিনি জামাতের সাথে তারাবিহ্ নামায কায়েম করাকে উত্তম বিদআত বলে অভিহিত করেছেন। অথচ নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন "সব বিদআতই গোমরাহী"। তিনি আরও বলেছেন, "কোন ব্যক্তি আমাদের এই ধর্মে যদি এমন জিনিস নুতনভাবে সংযোজন করে- যা ধর্মের অংশ নয়, তা বাতিল বলে গন্য হবে"। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) ধর্মে তারাবিহর নূতন বিদআত চালু করার দোষে দোষী। (নাউযুবিল্লাহ্)।

শিয়াদের এ অভিযোগ সত্য নয়। কেননা, হাদীসে মুতাওয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী করিম (দঃ) সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে তিন রাত্র পর্যন্ত জামায়াতের সাথে তারাবিহ্ নামায পড়েছিলেন। চতুর্থ রাত্রি থেকে তা বন্ধ করে দেন এবং এরশাদ করেন- "আমি ভয় করছি- এ নামায তোমাদের উপর ফরয হয়ে যেতে পারে।" হুযুর পুরনুর (দঃ)- এর ইনতিকালের পর ওহী বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং ফরয হওয়ার ভয়ের কারণ তিরোহিত হয়ে যাওয়াতে হযরত ওমর (রাঃ) নবীজীর সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করেছেন মাত্র। ইহা নুতন সংযোজন নয়। হযরত ওমর (রাঃ) জামাতের সাথে তারাবিহ আদায় করাকে উত্তম বিদআত বলার কারণ হলো- নবীজীর পরে নূতন করে তা পুনরায় চালু হয়েছে মাত্র। শাব্দিক অর্থে বিদআত হলেও পরিভাষায় তা সুন্নাত। কোন কাজ বন্ধ করার পেছনে বিশেষ কারণ থাকলে পরে সেই কারণের ভয় না থাকলে বা আশংকা দুরিভূত হয়ে গেলে মূল কাজ চালু করা বৈধ।

শিয়াগণ একদিকে জামায়াতের সাথে তারাবিহ্ নামাযকে বিদআত বলছে, অপরদিকে তারা হযরত ওমরের শাহাদত দিবস ৯ই রবিউল আউয়াল তারিখে শুকরিয়ার নামায আদায় করাকে বিদআত বলে মনে করছে না। অগ্নি উপাসকদের নওরোজ উৎসব পালন করা, মোতা বিবাহ বা সাময়িক অস্থায়ী ও কন্ট্রাক্ট ম্যারেজকে তারা বিদআত বা হারাম বলে মনে করে না। অথচ উম্মতের সর্বসম্মত রায় অনুযায়ী নওরোজ ও মুতা বিবাহ হারাম বলে ইজমা হয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদীন যে প্রথা চালু করেছেন তা বিদআত নয়- বরং সুন্নাত। যেমন- হযরত ওসমান (রাঃ) কর্তৃক কুরআন সংকলন ও জুমআর দিনের বর্তমান প্রথম আযান প্রচলন এবং হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক ইল্‌মে নাহু বা আরবী ব্যাকরণ চালু ইত্যাদি। নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করেছেন- "তোমরা

www.sunnibarta.com

আমার সুন্নাত এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত বা প্রথাকে মযবুত করে ধরে রাখবে"। সুতরাং চার খলিফা কর্তৃক চালুকৃত সমস্ত কাজই সুন্নাত। (বুখারী)

৩। হযরত ওসমান (রাঃ) এর বিরুদ্ধে শিয়াদের অপবাদ ঃ

(ক) শিয়াদের একটি বড় অভিযোগ হলো- "হযরত ওসমান (রাঃ) কুরআন শরীফ গ্রন্থাকারে সংকলনের সময় অনেক আয়াত বাদ দিয়েছেন, অনেক পরিবর্তন করে ফেলেছেন এবং সাহাবীদের ব্যক্তিগতভাবে সংগৃহীত কুরআন শরীফ জ্বালিয়ে দিয়েছেন"।

জবাব ঃ নবী করিম (দঃ) কুরআন মজিদ ২৩ বৎসরে খন্ড খন্ড পাতায় লিখিয়ে ছিলেন এবং সাহাবীগণ হেফ্য করেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ৩০ পারার ঐসব খন্ডপাতা সংগ্রহ করে কমিটির মাধ্যমে একত্রিত করে একটি জিল্দ্ বা নথি তৈরী করে সংরক্ষণ ও হিফাযত করেন। উক্ত কমিটির প্রধান ছিলেন কাতেবে ওহী হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)। হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)- এর মাধ্যমে পুনরায় ঐ কপি দেখে ৮টি মাসহাফ বা সংস্করণ তৈরী করে বিভিন্ন প্রদেশে সরকারীভাবে সংরক্ষণ করেন। এ সময় তিনি ত্রিশ পারা, ১১৪ ছুরা, সাত মঞ্জিল ও ৫৫৪ রুকু- ইত্যাদি তরতীব করে ২৭ দিনে রমযানে খতমে তারাবিহ পড়ার সুবিধার্থে সাজিয়ে ছিলেন মাত্র। এতে কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন কিছুই করা হয়নি। যিনি রাসুলের যুগে কোরআন লিপিবদ্ধ করেছিলেন- তিনিই হযরত আবু বকর (রাঃ)- এর খিলাফতকালে কুরআনকে এক নথিভুক্ত করেছেন। আবার হযরত ওসমানের (রাঃ) যুগেও তিনিই সংকলন আকারে সাজিয়ে ৮ কপি তৈরী করেছেন। সে সময় থেকে অদ্যাবধি পৃথিবী ব্যাপী হযরত ওসমান (রাঃ) কর্তৃক সর্ব সমর্থিত সংকলিত কুরআন মজিদই অনুসরণ ও তিলাওয়াত হয়ে আসছে। কিন্তু ২০০ বৎসর পর শিয়া ফির্কার প্রাধান্য হলে তারা হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে কুরআন পরিবর্তনের অপবাদ রটনা করে এবং নিজেরা একটি পৃথক কোরআন শরীফ তৈরী করে। তাদের কুরআন শরীফের নাম রাখা হয় মাসহাফে ফাতেমী। তারা বলে- নবী করিম (দঃ)- এর পর বিবি ফাতেমার নিকট ওহী ও কোরআন নাযিল হতো। ঐ কুরআনে সুরা আলী, সুরা ফাতিমা, সুরা বেলায়েত, সুরা হাসনাইন- ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে। কোন কোন শিয়া আখড়া বা শিয়া মসজিদে এই কথিত কুরআন দেখা যায়।

হযরত ওসমান (রাঃ) বিভিন্ন স্থান থেকে যেসব ব্যক্তিগত কপি সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলেছিলেন- সেগুলোতে কুরআনের আয়াতের সাথে নবীজীর ব্যাখ্যামূলক কিছু কিছু হাদীসও লিখিত ছিল এবং পঠন ও লিখন পদ্ধতি বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চারণ ভঙ্গিতে লেখা হয়েছিল। ঐ গুলি ছিল ব্যক্তিগতভাবে লিখিত নিজস্ব কপি। এগুলি যদি বহাল রাখা হতো, তাহলে বর্তমানে প্রাপ্ত ইঞ্জিল ও তৌরাত শরীফ- এর মতই বিকৃত হতো।

www.sunnibarta.com

কোরআনের মধ্যে হাদীস মিলিয়ে বিভিন্ন লিখন ও পঠন পদ্ধতি প্রয়োগ এবং স্থানীয় উচ্চারণের পদ্ধতি প্রচলন আরবের বিভিন্ন গোত্র, কুফা, বসরা, ইরান ও তৎসন্নিহিত এলাকার শিয়াদেরই অপকীর্তি ছিল। হযরত ওসমান (রাঃ) সেইসব বিকৃত কপি সরকারীভাবে উদ্ধার করে জনসমক্ষে পুড়িয়ে ফেলে ফিতনার দরজা চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এখন বর্তমান বিশুদ্ধ কোরআন পোড়ানো জায়েয নেই।

(খ) "এছাড়াও হযরত ওসমান (রাঃ)- এর বিরুদ্ধে স্বজন প্রীতি, সরকারী তহ্‌বিলের অপচয়, দোষী প্রমাণিত প্রাদেশিক গভর্ণরদের স্বপদে বহাল রাখা, মারওয়ানের মত দুষ্ট লোককে চীফ সেক্রেটারী নিয়োগ করা, তার পিতা হাকাম মুনাফিক- যাকে রাসুলুল্লাহ (দঃ) সিরিয়ায় নির্বাসিত করেছিলেন- পুনরায় তাকে মদিনায় এনে পুনর্বাসিত করা, হযরত মুয়াবিয়াকে শামের গভর্ণর নিযুক্ত করা, সরকারী ভূমিতে নিজস্ব উষ্ট্রবহর চড়ানো, কতিপয় সাহাবীকে অন্যায়ভাবে গভর্নরী পদ থেকে চাকুরীচ্যুত করা- ইত্যাদি মিথ্যা অপবাদ শিয়ারা রটনা করেছে"।

এই অপবাদের মাধ্যমে শিয়ারা বিরাট রাজনৈতিক ফায়দা লাভ করেছে। ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে তারা শিয়া সুন্নীর বিভেদ সৃষ্টি করে রেখেছিল। বর্তমানেও ইরানে খোমেনী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পেছনে ঐসব ফিৎনাই মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে। ইরানে সুন্নী মুসলমানকে অমুসলিম- সংখ্যালঘু ঘোষণা করা হয়েছে। হাজার হাজার সুন্নী মুসলমানকে বিভিন্ন অজুহাতে কতল করা হয়েছে এবং এখনও তা অব্যাহত রয়েছে। শিয়াদের এসব বানোয়াট অভিযোগকে ভিত্তি করেই বর্তমানে ইতিহাস লিখিত হচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে তা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

হযরত ওসমান (রাঃ) রাসুল (দঃ) কর্তৃক বেহেস্তের সনদ প্রাপ্ত, দুই কন্যার জামাতা হওয়ার গৌরব লাভকারী জিন্‌নুরাইন উপাধীপ্রাপ্ত, জুলহায়া, দুই বেহেস্তের মালীক বলে নবীজীর স্বীকৃতি প্রাপ্ত এবং খোদা তায়ালা কর্তৃক গুনাহর পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হিসাবে সনদপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি বার বৎসর পর্যন্ত নবীজীর আদর্শে খিলাফত পরিচালনাকারী খলিফা ছিলেন। সুতরাং শিয়াদের অভিযোগসমূহ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষ প্রসূত ছিল।

আহলে সুন্নাতের একটি মৌলিক আক্বীদা ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ "আলামাতুছ ছুন্নাতে ছালাছুন ঃ তাফ্‌দীলুশ শাইখাইন, হুববুল খাতানাইন, মুসিহ্ আলাল খুফ্‌ফাইন"। অর্থাৎ আহলে সুন্নাতের তিনটি প্রধান আলামত হলো (ক) শাইখাইন বা হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) কে সমস্ত উম্মতের উপর প্রাধান্য দেয়া (খ) খাতানাইন- অর্থাৎ দুই জামাতা- হযরত ওসমান ও আলীকে সমান ভালবাসা এবং (গ) মোজার উপর মাসেহ করা"।

শিয়াগণ উপরোক্ত তিনটি বিষয়কেই অস্বীকার করে। শিয়া ও সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে ঐ সময় প্রধান প্রভেদ ছিলো উপরোক্ত ৩টি বিষয়। প্রতিটি বাতিল ফির্কার

www.sunnibarta.com

বিরুদ্ধে সুন্নী আক্বীদা ভিন্নতর। সুতরাং বাতিল আক্বীদার সংখ্যা যত বাড়তে থাকবে, সুন্নী আক্বীদার সংখ্যাও ততই বাড়তে থাকবে। যেমনঃ ওহাবী ফির্কা ও মউদুদী ফির্কার বাতিল আক্বীদার সংখ্যা প্রধানতঃ সত্তর (৭০) ও একশত এগার (১১১)। এর বিপরীতে সুন্নী আক্বীদাও সত্তর এবং একশত এগারটি।

"রাসুল মাটির তৈরী, রাসুলের খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েব ছিলনা, তিনি হাজির নাজির নন"- এই তিনটি হলো বর্তমান ওহাবীদের ও ফুরফুরার আবদুল কাহহারের বাতিল আক্বীদা। এর বিপরীতে সুন্নী আক্বীদা হলো- "রাসুল নূরের সৃষ্টি, রাসুলের খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়ব ছিল, রাসুল হাজির ও নাজির"। মূল কথা হলো- যুগে যুগে বাতিল মতবাদের সংখ্যা যত বাড়তে থাকবে- সুন্নী আক্বীদার সংখ্যাও আনুপাতিক হারে প্রকাশিত হতে থাকবে।

৪। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর বিরুদ্ধে শিয়াদের মিথ্যা তোহ্মত ঃ

(ক) হযরত ওসমান (রাঃ) কে মদিনায় বিদ্রোহী কর্তৃক ঘেরাও অবস্থায় রেখে হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) মক্কা শরীফে হজ্ব করতে চলে যান। হজ্ব সমাপন শেষে তিনি মদিনায় না এসে বসরার দিকে চলে যান। তাঁর সাথে ১৬ হাজার লোক-লস্কর ছিল। হযরত আলী (রাঃ)- এর বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। অথচ কুরআনে এভাবে ঘুরাফেরা করা উম্মুল মুমিনীনদের জন্য নিষেধ করা হয়েছে। যেমন সুরা আহযাবের ৩২ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- "হে নবী পত্নীগণ! তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করো।" আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে আপন ঘরে অবস্থান করার জন্য নির্দেশ করেছেন এবং ঘরের বাইরে বের হতে নিষেধ করেছেন- অথচ হযরত আয়েশা (রাঃ) আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছেন"। (নাউযুবিল্লাহ্)।

শিয়াদের এই অপবাদের জবাব হচ্ছে ঃ উম্মুল মুমিনীনগণের জন্য যদি সদা সর্বদা ঘরের বাইরে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ হতো- তাহলে উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পরও নবী করীম (দঃ) তাঁদেরকে নিয়ে হজ্ব, ওমরা এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে গেলেন কিভাবে? তাঁদের পিতা-মাতার বাড়ীতে পাঠালেন কি করে? আত্মীয়-স্বজনদের অসুখ-বিসুখে সেবা করার জন্য প্রেরণ করলেন কেন?

এতে বুঝা গেল-বিনা প্রয়োজনে ঘুরা-ফেরা করাই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বৈধ প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়নি। শিয়ারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে হযরত আয়েশার (রাঃ) বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছে। **আয়াতের মর্মার্থ হলো- "বিনা পর্দায় অলিগলিতে এবং বাজারে জাহিলিয়াত যুগের সাধারণ নারীদের মত তাঁরা যেন চলাফেরা না করেন"**। শিয়াদেরই শ্রদ্ধেয়া জননী এবং মুসলিম নারীগণের ভূষণ

www.sunnibarta.com

হযরত বিবি ফাতিমা (রাঃ) প্রতি শুক্রবারে পর্দা সহকারে মদিনার তিন মাইল দূরে ওহোদ ময়দানে পায়ে হেঁটে গিয়ে হযরত আমির হামযার (দাদার ভাই) মাযার যেয়ারত করতেন। শিয়ারা এর কি জবাব দেবেন? তাদের কিতাবেও বিশ্বস্ত সূত্রে বিবি ফাতিমার এ ঘটনা বর্ণিত আছে। তাহলে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিরূদ্ধে এই অভিযোগ কেন?

(খ) তাদের দ্বিতীয় অভিযোগ হলো ঃ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বিবি খাদিজা (রাঃ)- এর প্রতি হিংসাপরায়ণা ছিলেন। বিবি খাদিজার (রাঃ) নাম শুনলে তিনি জ্বলে উঠতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজেই স্বীকার করেছেন যে, "নবী করিম (দঃ)- এর বিবিগণের মধ্যে কোন বিবির প্রতি আমি এত ঈর্ষাপরায়ণা ছিলাম না- যত ছিলাম বিবি খাদিজা (রাঃ)- এর প্রতি- অথচ আমি তাঁকে স্বচক্ষে দেখিনি। কিন্তু নবী করিম (দঃ) তাঁর কথাই বেশী স্মরণ করতেন"।

শিয়াদের এই অপবাদের জবাব ঃ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)- এর গায়রত বা ঈর্ষা প্রকাশ স্বয়ং নবী করিম (দঃ)- এর সম্মুখে ছিল। যদি তা দোষণীয় হতো- তাহলে তিনিই মালামত করতেন। অথচ এর কোন প্রমাণ নেই। স্বামী হয়ে নবী করিম (দঃ) নিজ স্ত্রীর কোন দোষ দেখলেন না- অথচ শিয়ারা নিজ মায়ের দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছে? তারা কেমন সন্তান- তা সহজেই অনুমেয়।

প্রকৃত ঘটনা হলো- নবী করিম (দঃ) বিবি খাদিজার (রাঃ) কথা স্মরণ করে অঝোরে কাঁদতেন। অবস্থা দেখে হযরত আয়েশা (রাঃ) মনে করতেন- হয়তো নবী করিম (দঃ) তাঁকে বেশী ভালবাসেন না। স্বামীর অধিক ভালবাসা প্রাপ্তিই ছিল তাঁর মূখ্য উদ্দেশ্য। এটা নিন্দনীয় হতে পারে না। তদুপরি স্বপত্নীদের প্রতি ঈর্ষা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এর উপর কারো নিয়ন্ত্রণ নেই। যেমন নবী করিম (দঃ) অন্যান্য বিবিগণের চাইতে হযরত আয়েশাকে বেশী ভালবাসতেন। তিনি বলতেন- "হে আল্লাহ! আমি এ ব্যাপারে সমতা রক্ষা করতে অক্ষম"। শরীয়তে অন্যান্য হকের ও অধিকারের বেলায় সকল স্ত্রীদের মধ্যে সমতার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু ভালবাসা বা মনের আকর্ষণের উপর কোন বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়নি।

(গ) শিয়াদের তৃতীয় অপবাদ হলো ঃ "বিবি আয়েশা (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)- এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরে অনুশোচনা করে নিজেই বলেছেন- "হায়! আমি আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। আমি যদি মানুষের স্মৃতিপট থেকে মুছে যেতাম- তাহলে কতই না ভাল হতো।" এতে বুঝা যায়- "তিনি অন্যায় করেছেন" (নাউযুবিল্লাহ্)।

শিয়াদের এই অপবাদের প্রথম জবাব ঃ হযরত আলীও তো উষ্ট্রের যুদ্ধে উভয় পক্ষের শহীদগণকে দেখে আফসোস করে বলেছিলেন- "হায়! আমি যদি মানুষের স্মৃতিপট থেকে মুছে যেতাম! তাহলে কতই না ভাল হতো"- শিয়াগণ এর কি জবাব দেবেন? এরূপ বলা দোষের হলে উভয়কেই দোষী বলতে হবে। পারবে কি ওরা তা বলতে?

প্রকৃত জবাব হলো ঃ কোন দূর্ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করা এবং নিজের কার্য্যাবলীর জন্য অনুশোচনা করা ঐ কাজের অবৈধতার প্রমাণ বহন করে না। হযরত আলী (রাঃ) ও বিবি আয়েশা (রাঃ) উভয়েই যুদ্ধের অহেতুক ক্ষয়ক্ষতির জন্য অনুশোচনা করেছিলেন। নিজেদের অপরাধ বা ভুলের জন্য নয়। বাতিল বলতে হলে উভয়কেই বলতে হবে। (নাউযুবিল্লাহ্)।

www.sunnibarta.com